'অত্যাচারিতের শিক্ষা'র প্রাককথন

আহমদ ছফা

পাওলো ফ্রেইরির Pedagogy of the Oppressed বইটির বাংলা অনুবাদের ভূমিকা হিশাবে ছফা এই লেখাটি লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দৈনিক যুগান্তর ৩ আগস্ট, ২০০১ এই লেখাটি তুলনামূলক কম পঠিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করে পুনর্বার ছাপে।

'পাখি কি আর চেঁচামেচি করে? পাখি কি আবার দুর্বিনীত আচরণ করে'? মহারাজের প্রশ্নের জবাবে পারিষদরা বললেন, 'না মহারাজ পাখি এখন শান্ত। কোন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ আর করে না। ডানা ঝাপটায় না।' মহারাজ বললেন, 'পাখিটির উচিত শিক্ষা হয়েছে।'

নিজের জবানিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোতা কাহিনীর একটা অংশ উদ্ধৃত করলাম। রবীন্দ্র ছোটগল্পের তোতা কাহিনীর পাখিটিকে শিক্ষা দেয়ার যে পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থার গড়মিল খুবই অল্প। বস্তুত প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার উদ্দেশেই রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটি লিখেছিলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, মানব জীবনের উৎকর্ষ, মানুষের উন্নততর সামাজিক সম্পর্ক এবং সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন যে-সকল মনীষীর মনে উদয় হয়েছে তাঁদের প্রায় সকলেই শিক্ষার প্রশ্নটির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। দার্শনিকদের গুরু প্লেটো নগর-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তির সর্বাধিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব। পরবর্তীকালে অনেক মনীষী প্লেটোনিক রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে আধুনিক ফ্যাসিবাদী এবং কমিউনিস্ট একনায়কত্বের ধারণার জনপ্রিয়তা মনে করেন। সত্যি করে বলতে গেলে রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্পর্কে প্লেটো যে রূপরেখা উপস্থিত করেছিলেন অন্য অনেকের কথা বাদ দিয়েও প্লেটোর ভক্তিমান-শিষ্য এরিস্টটল এক কথায় তা নাকচ করেছিলেন। কিন্তু প্লেটো মানুষের মানুষী সত্তার উৎকর্ষ সাধনের উপায় হিশেবে যে শিক্ষা-পদ্ধতির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন ফরাসি বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে দার্শনিক রুশো সেটাকে একটা অত্যুৎকৃষ্ট পদ্ধতি হিশেবে অভিহিত করতে কোনরকম কুণ্ঠা বা দ্বিধা অনুভব করেন নি।

শিশুদের নিয়ে ছফার উৎসাহের অন্ত ছিল না। ছবিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুলতান পাঠশালার শিশুদের দেখা যাচ্ছে।

আমরা রুশোর কথায় আসি না কেন? রুশোর 'দি সোশাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থের প্রথম বাক্যটি হচ্ছে 'মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মায়, কিন্তু তারপর সে সর্বত্র শৃঙ্খলিত হয়।' ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা যাক না কেন, রুশোর এই উচ্চারণের মধ্যে সত্যের ছিটেফোঁটাও নেই। না, মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায় না, মানুষ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাকে অর্জন করতে শেখে। তবু রুশো যে সংবেদনায় কথা ক'টি লিখেছিলেন সেগুলো বিপ্লবের পূর্বে ফরাসি সমাজের মন্ত্র-শক্তির মতো ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পেরেছিল। অধিক বাগ-বিস্তার করে লাভ নেই। আজকে শিক্ষা-বিজ্ঞানীরাও রুশোর নানা সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে তার শিক্ষা-বিষয়ক ধ্যান-ধারণাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

মানব সমাজে যারাই মনে রাখার মতো অবদান রেখেছেন, খুব গভীরভাবে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, তাঁরা প্রকাশ্যে হোক কি অপ্রকাশ্যে হোক, একটা শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। বুদ্ধদেবের কথাই ধরি না কেন তিনি বলতেন সমুদ্র জলের স্বাদ যেমন লোনা, আমার প্রচারিত যে ধর্ম তারও একটি স্বাদ আছে। সেই আস্বাদটির নাম নির্বাণ। বুদ্ধদেব এই নির্বাণতত্ত্বের প্রচার করতে যেয়ে হিন্দু ধর্মের যে একটা জীবনদৃষ্টি ছিল তার প্রতিবাদ করে আসছিলেন। তিনি বলেছিলেন বেদ সত্য নয়, ব্রাহ্মণের অলৌকিক ক্ষমতা নেই। মানুষের ভেতরেই তার মুক্তির উপায় নিহিত। অর্থাৎ বুদ্ধদেব তার মতামত প্রচার করতে গিয়ে একটা শিক্ষা-ব্যবস্থাই প্রবর্তন করে আসছিলেন। এক জীবনদৃষ্টির বদলে আর এক জীবনদৃষ্টি, জগৎ সম্পর্কে এক ধ্যান-ধারণার স্থলে আরেক ধরণের ধারণা উপস্থিত করা- সেটা বুদ্ধদেব কেন, সব ধর্মের প্রচারকরাই অল্প-বিস্তর করে গেছেন।

২.

ধর্মগুরুদের দিন শেষ। এখন জগতে আর অলৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ড বিশেষ ঘটে না। স্বর্গ থেকে সোনালি ডানার জিব্রাইল আসমানি শিক্ষা নিয়ে কোন অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তির অন্তর আলোকিত করে না। বিশ্ব জুড়ে শিক্ষার একটি সার্বজনীন

ক্ষেত্র এবং বৃত্তি দুই-ই তৈরি হয়েছে। বিশেষত কৃৎ কৌশল এবং যন্ত্র বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির ফলে শিক্ষা আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে রক্তবাহী ধমনীর ভূমিকা পালন করছে। প্রতিটি রাষ্ট্র জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য মানব সম্পর্ক এবং জাগতিক উন্নতির বিষয়ে কতদূর উৎকর্ষ অর্জন করেছে সেগুলো সম্পর্কে সঠিক অবহিত হওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় হলো সে বিশেষ রাষ্ট্রটির প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাটি সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করা। একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে- জ্ঞান মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে। প্রাচীন শাস্ত্রে জ্ঞান এবং ঈশ্বরে কোন পার্থক্য করা হয় নি। ঈশ্বরের মুখ থেকে যে বাণী নির্গত হয়েছে তা ঈশ্বরের মতোই পবিত্র। সকল সমাজে এমনকি একেবারে আদিম উপজাতি সমাজেও জ্ঞানকে সর্বাধিক সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। একইভাবে তথাকথিত সভ্য সমাজে জ্ঞান একটা নির্ণয়ক ভূমিকা পালন করে সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মুশকিলের কথা হলো এই যে, সকলের জ্ঞান এক রকম নয়। আদিম সমাজে ভূত- তাড়ানোর ওঝাকে জ্ঞানী মনে করা হয়, ভূত-তাড়ানো মন্ত্রকে জ্ঞান হিশেবে মেনে নেয়া হয়। একইভাবে সুসভ্য সমাজেও আধুনিক যন্ত্র- বিজ্ঞান এবং কৃৎ কৌশলের উৎকর্ষকে জ্ঞান হিশেবে চিহ্নিত করা হয় এবং পারঙ্গম ব্যক্তিদের জ্ঞানী বলে স্বীকার করে নিয়ে সম্মান-শিরোপা দেয়া হয়। ব্যক্তি বিশেষে, দেশ বিশেষে, সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম বিশেষে জ্ঞানের যে বৈপরীত্য সেখানেই হলো মানুষে মানুষে ভেদাভেদের উৎস।

জ্ঞানকে পবিত্র বিবেচনা করা হয়, কারণ যে শ্রেণীর অধিকারে জ্ঞান থাকে তারা সমাজের বাকি অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরা ছিলেন জ্ঞানী, তাই গোটা সমাজের ওপর তাদের প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। আমাদের যুগে জ্ঞান ঠিক একটা শ্রেণী বা জাতিগোষ্ঠীর সম্পত্তি বিশেষ—এই ধারণার অবসান হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ বংশে, গোত্রে জন্মালে জ্ঞানী হওয়ার অধিকার জন্মায় সেই ধারণার গোড়া ঘেঁষে কোপ দেয়া হয়েছে বহু আগেই। আমাদের যুগে যারা শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন তারা প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণদের মতো এক ধরণের সামাজিক কর্তৃত্ব আয়ত্ত করে থাকেন। যখনই কোন দেশ, কোন শ্রেণী অন্য দেশ বা অন্য শ্রেণীসমূহের ওপর একচ্ছত্র প্রতিপত্তি দীর্ঘদিনের জন্য বিস্তার করতে চায় তারা তার উপায় হিশেবে শাসিত জাতি বা শাসিত শ্রেণীসমূহের ওপর একটা শিক্ষা পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়। সামাজিক ক্ষেত্রে হোক, আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হোক, যারা একচেটিয়াভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন তাদের হাতে কর্তৃত্ব আপনিই এসে যায়।

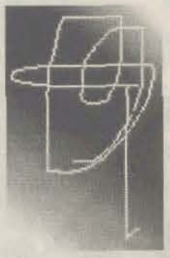

৩.

শিল্প বিপ্লবের পরে ন্যূনাধিক আড়াই শতাব্দীকাল- বিস্তৃত সময়ে অনেকগুলো বড় বড় পরিবর্তন পৃথিবীর মানুষের চিন্তা-চেতনার ধারাকে অনেকাংশে বদলে দিতে সক্ষম হয়েছে। তারপরও একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, শিক্ষার প্রভূত্ব রক্ষার উপায় হিশেবে শিক্ষার 'মনোপলি'-নীতি এখনও পর্যন্ত ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে।

৪.

আমরা মহাভারতের একলব্যের গল্প জানি। একলব্য নিম্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত বলে কুরুবংশের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের শিষ্য হবার অধিকার অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু একলব্য হতাশ হয়ে আত্মশক্তির ওপর ভরসা হারায় নি। গভীর জঙ্গলে দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি তৈরি করে তাকে গুরু জ্ঞান করে নিজে-নিজে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করতে থাকে। পরে একদিন যখন আবিষ্কৃত হলো একলব্যের সিদ্ধি দ্রোণাচার্যের আউয়াল-শিষ্য অর্জুনের চাইতে বেশি না হলেও কম নয়, চণ্ডাল সন্তানের এই ঔদ্ধত্য দেখে দ্রোণাচার্যের টনক নড়ল। তিনি দাবি করে বসলেন- আমি যদি তোমাকে শিখিয়ে থাকি তাহলে আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে দেবার গল্প সকলেই জানেন। মহাভারতকার একলব্যকে ভক্তিমান শিষ্য হিশেবে দেখিয়েছেন। এতে মহাভারতকারের মানসিকতার একটি দিক অনুদঘাটিত থাকে নি। অন্ত্যজ জাতি থেকে উদ্ভূত লোকদের ভক্তি ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য কিছুতে অধিকার থাকা উচিত নয়। দ্রোণাচার্য কি-রকম নিষ্ঠুর কাজ করেছেন সেটির প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বেদব্যাস একলব্যের ভক্তিটি এত বড় করে দেখালেন ! মহাভারতের যুগ কবেই অতীত হয়েছে, কিন্তু একলব্যের ঘটনাটির তাৎপর্য অদ্যাবধি ফুরিয়ে যায় নি।

> পাইলো ফ্রেইরি মার্কিন কর্তাব্যক্তিদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তাঁর বইয়ের জন্য। কি বিপজ্জনক কথা ছিল এই বইতে যাতে সিআইএ -র মাথাব্যথার কারণ হতে পারে?

৫.

যে গ্রন্থের ভূমিকা প্রসঙ্গে উপরের কথাগুলো বিধৃত করলাম : তার লেখক পাওলো ফ্রেইরির অবস্থা বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেও একলব্যের অবস্থার চাইতে আলাদা নয়। পাওলো ফ্রেইরি 'pedagogy of the Oppressed' এই গ্রন্থটি রচনা করার কারণে পৃথিবীর সবচাইতে ধনী এবং শক্তিমান দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের বিরাগভাজন হয়ে উঠেছিলেন। ব্রাজিলের সাও পাওলোর বস্তিতে কাজ-করা একজন সামান্য গবেষকের একটি গ্রন্থের মধ্যে এমন বিপজ্জনক কী বিষয় স্থান পেতে পারে যা আমেরিকার সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন গোয়েন্দা-সংস্থা সিআইএ-এর মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ গ্রন্থ যারা পাঠ করবেন পাওলো ফ্রেইরির চিন্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন- এই আশা আমাদের আছে। আমরা এও মনে করি, কি কারণে পাওলো ফ্রেইরি নিন্দিত এবং বিদ্বেষভাজন হয়ে উঠেছিলেন তার কারণও অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

পাওলো ফ্রেইরি তার এই বইটিতে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন যা প্রবর্তন করতে পারলে সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষ তাদের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে পারবেন। মানুষ যখন তার প্রকৃত

অবস্থান সম্পর্কে বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারেন, তখন তাকে অন্যরা জড় পদার্থ হিশেবে ব্যবহার করতে পারে না। প্রাণবান সত্তা হিশেবে সে তার নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। জগতে অন্য শ্রেণীর ভূমিকা ভূলিয়ে দিতে না পারলে অন্য জাতি, অন্য গোষ্ঠী, অন্য ব্যক্তি কারও ওপর প্রভুত্ব বিস্তার সম্ভব নয়। আত্মপরিচয়লোপী যে সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া শাসকেরা প্রয়োগ করে তার নাম খুব দ্রুত অর্থে একটা জটিল শিক্ষা-পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যের চাইতে পোশাককে, লাবণ্যের চাইতে প্রসাধনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়; গুরু মহাশয় যা বলছেন শোন এবং মান্য কর, সভ্য জাতিগুলো যা করতে বলছে অনুগত সেবকের মতো অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাও, আখেরে তোমার মোক্ষলাভ ঘটবে। কম্যুনিজমের ভরাডুবি ঘটেছে। তারপরও সমাজ-বিজ্ঞানীরা মার্কস-লেনিনের চিন্তা-চেতনার কতিপয় প্রণিধানযোগ্য দিক নাকচ করতে পারবেন বলে মনে হয় না। লেনিন বলতেন, দাসজাতির কোন সংস্কৃতি নেই। দাস তিন ধরণের- এক ধরণের দাস এটা অনুভব করতে পারে না, আরেক ধরণের দাস শৃঙ্খলকে গলার মালা হিশেবে গ্রহণ করে এবং আরেক ধরণের দাস আছে যারা দাসত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করে। আমরা পাওলো ফ্রেইরির এই গ্রন্থটির মতামতের বিষয়ে প্রবেশ করছি না। যেহেতু নির্যাতিত মানুষের মুক্তির প্রশ্নে লেনিন এবং ফ্রেইরির অবস্থান একই পাটাতনে তাই দু'জনকে অনেক সময় একই দর্শনের অনুসারী হিশেবে মনে করা বিচিত্র নয়। এক সময় পাওলো ফ্রেইরিকে বিপজ্জনক ব্যক্তি মনে করা হয়েছিল এ কারণে যে, তাকে একজন ছদ্মবেশী কম্যুনিস্ট-শিক্ষাবিদ বলে ধরে নেয়া হয়েছিল। মার্কসবাদীদের অবস্থান এবং পাওলো ফ্রেইরির অবস্থানের ফারাকটা এই জায়গায়- মার্কসবাদীরা মনে করেন নিচে থেকে সমাজকে ভাঙতে পারলে সমাজের আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু ফ্রেইরি তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন, সমাজকে উপর এবং নিচ দু'দিক থেকেই না ভাঙলে সুস্থ সমাজ সৃজন করা সম্ভব নয়। পাওলো ফ্রেইরি বিমানবিকীকরণের প্রশ্নটিকে সূর্যালোকের সামনে নিয়ে এসেছিলেন। যে মানুষ নির্যাতন করে এবং যে মানুষ নির্যাতিত হয় উভয়ই দীর্ঘকালব্যাপী ধারাবাহিক বিমানবিকীকরণ প্রক্রিয়ার শিকার। আসলে পাওলো ফ্রেইরি বলতে চেয়েছিলেন, নির্যাতন করতে এবং নির্যাতিত হতে মানুষের জন্ম হয় নি। নানা গালভরা অভিধার অন্তরালে জীবনবিরোধী শিক্ষা-পদ্ধতি এই বিমানবিকীকরণ শিক্ষা-পদ্ধতিটিকে টিকিয়ে রেখেছে। পরে যখন আবিষ্কার হলো যে, পাওলো ফ্রেইরির প্রস্তাবিত শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে কোন কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র নেই তখনই ক্যাথলিক চার্চ কম্যুনিজমের বিকল্প হিশেবে সমগ্র পৃথিবীতে কম্যুনিজম ঠেকাবার উদ্দেশে পাওলো ফ্রেইরির মতামতের প্রচার ও প্রসার কার্যে ভূমিকা রাখতে এগিয়ে এল। অর্থাৎ এটা একটা নির্দোষ থিওরি। কোন রক্তগন্ধ এতে আবিষ্কার করা যাবে না। ক্যাথলিক চার্চ পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষাকে খ্রিস্টের শিক্ষার একটি অগ্রবর্তী ধাম হিশেবে বিবেচনা করে পাওলো ফ্রেইরিকে তুলে ধরছে। গোড়া কম্যুনিস্টদের মতো না হলেও পাওলো ফ্রেইরি ব্যাপক অর্থে একটা সমাজ বিপ্লবের অনিবার্যতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এখন পাওলো ফ্রেইরিকে গরিব মানুষদের মক্তব-শিক্ষার কারিকুলামের মতো একটা পদ্ধতি হিশেবে দেশে-দেশে রফতানি করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও কুখ্যাত এনজিওদের প্রচেষ্টায় পাওলো ফ্রেইরির নাম পরিচিত হয়ে উঠেছে। তারা পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন করে সুযোগহীন শিশুদের শিক্ষা দিচ্ছেন। এই কর্মসূচি প্রদর্শন করে ধনী দেশসমূহের কাছ থেকে অর্থ জোগান পাচ্ছেন বলেই পাওলো ফ্রেইরিকে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কহীন একজন সন্ত হিশেবে গণ্য করা হয়ে আসছে। বিদেশ থেকে অর্থ না এলে পাওলো ফ্রেইরির নাম হয়তো এমনভাবে আমাদের বস্তিতে, গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছতে পারত না। কোন কোন প্রতিষ্ঠান পাওলো ফ্রেইরি প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি চালু করার জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যাচ্ছে। তাদের কাজের সবটা যে নঞর্থক এ কথা আমরা বলব না। কিন্তু তারা পাওলো ফ্রেইরির চিন্তাকে হাতুড়েসুলভ মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করার মাধ্যমে শিক্ষা বিজ্ঞানের ওপর একটা মারাত্মক অবিচার করে যাচ্ছেন। তারা আলাদা পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন করছেন, আলাদা শিক্ষা-দান পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন: কিন্তু তার মধ্যে সত্যিকার শিক্ষা কতটুকু আছে তা ঘোরতর বিতর্কের বিষয়। পাওলো ফ্রেইরির পদ্ধতিকে তারা উল্টোদিক থেকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে আমাদের শিক্ষা চিন্তার ঐতিহাসিক যে একটা বিবর্তন আছে তার ওপর মারাত্মক অবিচার করা হচ্ছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ আরও অন্যান্য মনীষী যারা সার্বজনীন শিক্ষার একটা বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি নির্মাণের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন সেটাকে পাশ কাটিয়ে আনকোরা একটা পদ্ধতিকে ডাল-মূল ছেঁটে প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন। আমি মনে করি এটা অবিমৃষ্যকারিতারই নামান্তর। দেশের সর্বাধিক বৃহত্তম সাহায্য-সংস্থাটির শিক্ষা কর্মসূচির দিকে দৃষ্টি রেখে কথাগুলো বলা হলো।

এই বইটির বাংলা অনুবাদ হলো। এটা বাংলাদেশের জন্য একটা মস্ত বড় সুখবর। আমরা আশা করি পাওলো ফ্রেইরির তত্ত্বের অপপ্রয়োগ কিভাবে হচ্ছে তার স্বরূপটি এ গ্রন্থ দেখিয়ে দিতে পারবে।

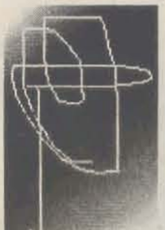

......এবং আরেক ধরণের দাস আছে যারা দাসত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করে।